কথাসাহিত্যের ধারা

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আজকাল স্রষ্টার অপেক্ষা উপদেষ্টার সংখ্যা হয়েছে বেশি। উপদেষ্টার দল বলছেন লেখকদের—এই কর, এই করা উচিত। তাঁরা চেয়ে আছেন ইউরোপ ও আমেরিকার কথাসাহিত্যের ধারার দিকে। নিজেরদেশের যতটুকু জীবনের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়, তাঁরা ভাবেন তার বাহিরে আর কিছুই নেই, থাকতে পারে না, যে সামাজিকবা যৌনসমস্যার সম্মুখীন তাঁরা হয়েছেন কিংবা হন্‌নি, হওয়াউচিত বলে ভাবেন, তার বাইরে আর কোনো সমস্যা নেই।তাঁদের মতে তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ জগতের বাইরে যা কিছু, সব প্রাক্‌পুরাণিক সুতরাং অকিঞ্চিৎকর।

আর একদল উগ্র সনাতন-পন্থীয়। তারা কোনোনীতিবিরুদ্ধ ভাবের ছোঁয়াচ লাগতে দেবেন না সাহিত্যে।এ নীতি অবশ্য তাঁদেরই মন-গড়া নীতি। সাহিত্যের শক্তি ওপ্রসারতা বড় বেশি, প্রক্ষিপ্ত বীজ কত উর্বরা ভূমিকে আশ্রয় করে অঙ্কুরিত হয়, সুতরাং দিতে হয় বেছে বেছে সৎনীতিরবীজ ছাড়াও।

সুখের বিষয় এই যে, সত্যিকার কথাসাহিত্যিক এঁদেরকারো কথা, তথা বুদ্ধিবাদী, ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিজ্‌ম-এর খাঁটিগোঁড়া যাঁরা, তাঁদেরও কথা শোনেন না। কারণ শুনতে গেলে তাঁদের সৃষ্টির স্বাধীনতা ভীষণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়—আড়ষ্ট ভাবথেকে কোনোকিছুর সৃষ্টিসম্ভবহয়নি। খেয়ালখুশিনিয়ে সৃষ্টিতাতে বেড়া নেই, গণ্ডি নেই। পা গুনে গুনে চলে'চলার আনন্দতারা পান না।

কিন্তু এখানে একটা বড়ো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়—কিলেখক, কি সমালোচকের। প্রশ্নটা এই, কথাসাহিত্যের mission কি ?নিছক গল্প সৃষ্টি ?সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, যাহয় একটা ঘটনা, মনস্তত্ত্ব ও পরিস্থিতির উদ্ভব করে শেষ পর্যন্তএকটা কোনো রসসৃষ্টি করা ?কারণ রসসৃষ্টি অনেক সময় ঘটনাসংস্থানের বা পরিস্থিতির নিখুঁত বাস্তবতার উপর নির্ভর করেনা, তা আমরা সকলেই আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি।

অথবা মানবমনের ও মানব জীবনের অসীম বৈচিত্র্যওকি বিপুল সম্ভাব্যতার ওপর আলোকপাত করা তাঁদের সৃষ্টচরিত্র ও ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের আশ্রয় গ্রহণ করে ?

এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি এবং প্রশ্ন খুব সঙ্গীন—বহু। কূটবিতর্কের অবকাশ উন্মুখ হয়ে নিজের সুযোগ খুঁজচে এইপ্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে তাও বুঝি। পর্বত ডিঙানো না যায় এড়িয়েচলাও যায়। কিন্তু এখানে সরল মনে আমাদের এই প্রশ্নেরমীমাংসায় অগ্রসর হতে হবে।

সে সহজ মীমাংসা এই যে, কথাসাহিত্য দুই শ্রেণীরই। তার গণ্ডির মধ্যে উভয় ধরনের সৃষ্টিরই স্থান আছে। জগতেরসাহিত্যে Steadhal-এর স্থান আছে, Sinclair Lewis বা James Joyce-এরও স্থান আছে। শুধু স্থান অছে নয়, প্রয়োজন আছে।

সত্য অভিজ্ঞতা থেকে নির্বাচন করে নেবার অধিকারসকল লেখকেরই আছে। অখণ্ড সত্যের ওপর দর্শনবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে,কথাসাহিত্য হয়না।রসসৃষ্টির জন্যে নিপুণ নির্বাচনের প্রয়োজন। আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যেএমন অনেক ব্যাপার ঘটে, যা সমগ্রভাবে গ্রহণ করলে অনেকসময় গল্পে বা উপন্যাসে বাঞ্ছিত রস ক্ষুণ্ণ হয়,

এমন কি বিরুদ্ধরসের সৃষ্টি করা হয়। নির্বাচনের স্বাধীনতা শিল্পীর আছে, এরজন্যে তাকে দোষী করা চলে না। ও কথাটা বলেন নি কেন, এপ্রশ্ন করা চলে না যদি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত রসকে তিনি অখণ্ডভাবেসৃষ্টি করতে পেরে থাকেন।

এজন্যে বইয়ের জগতে সৃষ্ট সত্য প্রকৃত সত্য থেকে স্বতন্ত্র।বাইরে যা ঘটে বইয়ে তা ঘটেনা। না ঘটলেও আমরা তাবিশ্বাস করি, সৃষ্ট রসকে উপভোগ করি। দর্শনের বা বিজ্ঞানেরভিত্তিতে গল্পের বা উপন্যাসের সত্যকে বিচার করতে গেলেচলে না। তবে কি তা সম্পূর্ণ মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে ?তাওনা। সম্পূর্ণ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে চলে না—একথার যতরকম অর্থ হয়, সবই উপরোক্ত ক্ষেত্রে খাটবে। তাবলে মিথ্যা এই অপবাদ দিয়ে কোনো সত্যিকার নিপুণ সৃষ্টিকেঅপাংক্তেয় করে রাখা চলবে না। তাহলে জগতের অনেক বড়বড় মহাকাব্য, গল্প, রূপকথা, কাহিনীকে অপাংক্তেয় করতেহয়।

নির্বাচনের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলে ব্যাপার অনেকদূর গড়ায় কিন্তু। রামের প্রেম কাহিনী মানুষের জীবনেরএকটা বড় অভিজ্ঞতা, শ্রীচৈতন্য ভগবদ্‌প্রেমে বিভোর হয়ে কেমন করে সংসার ত্যাগ করে গেলেন—এ আর একটা বড়অভিজ্ঞতা। দুই শ্রেণীর অভিজ্ঞতাই নির্বাচন করার স্বাধীনতালেখকের। যা রোজ ঘটে তাই বেশি সত্য, আর যা সাধারণতঘটে না,কালেভদ্রে ঘটে, তা সত্য নয়, এসব কথার কোনো অর্থনেই। প্রথমোক্ত অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে যে কথাসাহিত্য তাযদি বাস্তব জীবনের দর্পণ হয়, তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিজ্ঞতাযদি কেউ চিত্রিত করে, তাকে ভাববিলাসী অবাস্তবের পসারীবলা যায় না। সেও মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিবদ্ধ, সুতরাংবাস্তব।

কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ফ্যাশান আছে। ফ্যাশানজিনিসটা গণমনের দ্বারা শাসিত—অনেকসময় তার মধ্যেযুক্তি থাকে না, থাকে হুজুগ। অনেক সময় ক্ষুদ্র সত্যকেঅবলম্বন করে কথা রচনা করবার হুজুগ আসে, সে সময় শুধু রামের প্রেমকাহিনীই রচিত হয়ে থাকে। সেই যুগে লোকেতাকেই বড় বলে ব্যাখ্যা করে, এবং সাধুভাষায় রচিত তারবহুবিধ প্রশস্তি পাঠকরে। বলে, আমাদের মনের অনেক জটিলসমস্যার মীমাংসা হল।

তারা কেউ মিথ্যা বলে না, ক্ষুদ্র সত্যের ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে সেসমস্যাও সত্য, তার মীমাংসাও সত্য। কিন্তু বৃহত্তর সত্যের ক্ষেত্রকে আশ্রয় করে যে সাহিত্য রচিত হয় তাকে এখনরোমান্টিক বলে অভিহিত করাই ফ্যাশান। ফ্যাশান হোক ক্ষতি নেই; কিন্তু মানুষের রোমান্টিক অভিজ্ঞতা অবাস্তবনয়—একথা স্বীকার করতেও কোনো লজ্জা নেই।

দু'দিন বা দশদিন পরে কেউ আমার বই পড়বে না, এভয় কোনো সত্যিকার কথাসাহিত্যিক করেন না। করেন তাঁরা যাঁরা একটি মিথ্যা ভবিষ্যতের ধূম্রলোকে নিজেদের চিরপ্রতিষ্ঠ দেখতে গিয়ে বর্তমানের দাবিকে অস্বীকার করেন। কেউ বাঁচে নি, বড় বড় নামওয়ালা কথা-সাহিত্যিক তলিয়ে গিয়েচেনকালের ঘূর্ণিপাকের তলায়—সেই যুগের প্রয়োজন শেষ হয়েগেলে পরবর্তী যুগের লোকেরা ধুলো ঝেড়ে ছেঁড়াপাতাগুলোউদ্ধার করবার কষ্টও স্বীকার করে না। দু'দশজন সাহিত্যরসিক, দু'পাঁচজন পণ্ডিত, দু'একজন বৈদগ্ধ্য মানুষ ছাড়া আজকালকারযুগেকথাসরিৎসাগরকে কে পড়ে, গোটাঅখণ্ড আরব্য উপন্যাসকে পড়ে, ড কুইকসোট কে পড়ে ?হল, চসার, দান্তে, মিল্টন, এঁদের কথা বাদ দিই—ছাত্র বা অধ্যাপক ছাড়া কেউ এঁদেরপাতা উল্টায় না—সকলে তো কাব্যপ্রিয় নয়—কিন্তু অত বড়যে নামজাদা ঔপন্যাসিক বালজ্যাক তাঁর উপন্যাসরাশির মধ্যে কখানা আজকাল লোকেশখ করে পড়ে ?স্কট, হেন্‌রি, জেম্‌স, থ্যাকারে, ডিকেন্স সম্বন্ধেও অবিকল এই কথা খাটে। ফিল্ম নাউঠলে অনেকের অনেক উপন্যাস কি নিয়ে লেখা লোকে তাইজানত না। নামটাই থেকে যায় লেখকের, তাঁর রচনা আধমরাঅবস্থায় থাকে অনেক ক্ষেত্রেই মরে ভূত হয়েযায়।

জানি, একথা আমাদের স্বীকার করতে মনে বড় বাধে। খোলাখুলিভাবে বললে আমরা এতে ঘোর আপত্তি করি—বিশ্ব, অমর, শাশ্বত প্রভৃতি বড় বড় গালভরা কথা জুড়ে জুড়ে দীর্ঘ ছাঁদে সেন্টেন্স রচনা করে তার প্রতিবাদ করি। কিন্তু আমরা মনেমনে আসল কথাটি সকলেই জানি। পার্ক স্ট্রীটে ওয়েলডন্‌লাইব্রেরি একটা খুব বড় বিলিতি ও

আমেরিকান উপন্যাসআমদানিকারক লাইব্রেরি—অনেক সাহেব মেম, আমাদেরদেশের লোক নভেল পড়বার জন্যে তার সভ্য হয়ে থাকেন। কিন্তু তিন বছর অন্তর বইয়ের আলমারি থেকে সমস্ত পুরাতন বই নিষ্কাশিত করে দিতে হয়—সস্তায় সেগুলি পুরানো বইয়েরদোকানদারেরা নীলামে ডেকে নেয়। লোকের হুজুগ নতুন বইচাই, এ মাসের যদি হয় তবে আর ও মাসের চাইবে না—প্রায় সেই অবস্থা। ভালো মন্দের বিচার একেবারে যে নেই তানয়—কিন্তু খুব বেশি নেই।

ওপরের সব কথা স্বীকার করে নিলেও একটা কথা থেকে যায়। যে সাহিত্য টবের ফুল—দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকড়চালিয়ে যা রসসঞ্চয় করছে না, দেশের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ, বেদনা যাতে বাণী খুঁজে পেলে না, তাহয় রক্তহীন, পাণ্ডুর, থাইসিসের রোগীর মতো জীবনের বরেবঞ্চিত, নয়তো সংসার-বিরাগী, ঊর্ধ্ববাহু, মৌনী যোগীর মতো সাধারণ সাংসারিক জীবনের বাইরে অবস্থিত। মানুষের মনেরবা সমাজের চিত্র হিসেবে তা নিতান্তই মূল্যহীন।

পূর্বেই বলেছি মিথ্যাকে আশ্রয় করে কথাসাহিত্যিকরসসৃষ্টি করতে পারেন না। কিন্তু সে হয় মানুষকে ক্ষণকালেরজন্যভুলিয়ে রাখবার সাহিত্য—সমাজেরও জীবনের সত্য চিত্র হিসেবে তার মূল্য কিছুই থাকে না।

গভীর রহস্যময় এই মানবজীবন। এর সকল বাস্তবতাকে, এর বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ার ভার নিতে হবে কথাশিল্পীকে। তাঁকে বাস করতে হবে সেখানে, মানুষেরহট্টগোল, কলকোলাহল যেখানে বেশি, মানুষের সঙ্গে মিশতেহবে, তাদের সুখদুঃখকে বুঝতে হবে, যে বাড়ির পাশেরপ্রতিবেশীর সত্যিকার জীবনচিত্র লিখেচে, সে সকল যুগেরসকল মানুষের চিত্রই এঁকেচে, চাই কেবল মানুষের প্রতিসহানুভূতি, তাকে বুঝবার ধৈর্য। ফ্লবেয়ার বলেছেন, মানুষ যাকরে, যা কিছু ভাবে, সবই সাহিত্যের উপাদান। কথাশিল্পী যানিজের চোখে দেখেছেন, তাই তাঁকে লিখতে হবে, শোভনতার খাতিরে যদিতিনি জীবনের কোনো ঘটনাকে বাদ দেন, চরিত্রেরকোনো দিক ঢেকে রেখে অঙ্কিত চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত বা সুষ্ঠুকরবার চেষ্টা করেন—ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

Emma Bovary-র স্রষ্টার উপযুক্ত কথা বটে।

কিন্তু এই বাস্তবতার কি একটা সীমা নেই ?জীবনের নগ্নচিত্র—দিগ্বসনা ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবীর মতো করাল—সে চিত্র মানুষের মন ভয় সঞ্চার করে, অবসাদ আনে, জুগুপ্সার উদ্রেক করে—সাধারণ রসবিলাসী পাঠকের সাধ্য নয় সে কঠিন, নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়া। সূর্যের অনাবৃত তাপ পৃথিবীর মানুষ সহ্য করতে পারে না তাই বহুমাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের মধ্যদিয়ে তা পরিস্তুত হয়ে, মোলায়েম হয়ে, অনেক পরিমাণে সহনীয় হয়ে তবে আমাদের গৃহ-অঙ্গনে পতিত হয় বলে রৌদ্রআমাদের উপভোগ্য, প্রাণীকুলের উপজীব্য।

সে আবরণ দেবেন শিল্পী তাঁর রচনায়। নির্বাচনেরস্বাধীনতা তিনি ব্যবহার করবেন শিল্পীর সংযম ও দৃষ্টি নিয়ে।

অন্যপক্ষে বাস্তবতার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এক ধরনেরউল্টো রোমান্টিসিজ্‌ম্‌।

বিগত যুগের এক শ্রেণীর উপন্যাসে যেমন আমরাপড়তাম—'অদ্য পূর্ণিমা রজনী। নির্মল গগনে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে। পূর্ণ শশধরের শুভ্র কৌমুদী প্লাবনে সরোবরহাসিতেছে, কুমুদিনী হাসিতেছে...এমন সময়ে একবিংশতিবর্ষীয়া পরমাসুন্দরী যুবতী সহাস্যবদনে'...ইত্যাদি।

এ ধরনের রচনা পড়লে আজকাল যেমন আমাদের গা ঘিন ঘিন করে—ঠিক সমানই অবস্থা হয় যে রচনায় জীবনের সব নিষ্ঠুরতা, দৈন্য, কুশ্রীতা, ক্লেদকে এক জায়গায় জোর করেজড়ো করে এনে সকলের চোখের সামনে ধরা হয়।

রুচি ও শোভনতার দাবিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতেপারেন না কথাশিল্পী। যিনি যত বড় বাস্তবপন্থীই হোন জীবনেরসম্পূর্ণ সত্যকে আঁকবার সাহস কি তাঁরই আছে ?

নির্জলা সত্য মায়ামৃগের মতো শিল্পীকে গহন থেকেগহনতর রহস্যের পথে, বিপদের পথে নিয়ে যায়। সাধ করেকে নিজেকে বিপদের জালে জড়াতে ইচ্ছে করে ?তা ছাড়া অখণ্ড সত্যের রূপ দেখবার সৌভাগ্যও তো সকল শিল্পীর হয়না। এমন অনেক দিক আছে জীবনের, নারীর প্রেমের, নিজেরমনের গোপন রূপের, মানুষের চরিত্রের—যা কেবল দীর্ঘ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরে প্রকাশ পায়। সে অভিজ্ঞতাসঞ্চয় করা সময়সাপেক্ষ। অল্পবয়সে সে গভীর জ্ঞান সকলেরকরায়ত্ত হয় না। জনপ্রিয়তার স্পর্ধায় যে শিল্পী মনে করে তিনি জীবন সম্বন্ধে যা লিখছেন তাই সত্য বলে সবাই মেনেনেবে, তিনি পাঠকবর্গকে প্রতারিত তো করেনই, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও প্রতারিত করেন।

শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায় যে, যুগের প্রয়োজন বা ফ্যাশানবা হুজুক শেষ হয়ে গেলে জোলার জারমিনাল বা নানার মতোবাস্তবপন্থীরচনার যে গতি, ভিকটর হিউগোর লেমিজারাবলেরমতো রোমান্টিক উপন্যাসেরও সেই একই গতি হয়—অর্থাৎ লোকে আর পছন্দ করে না, কৌতূহলের ভারকেন্দ্র অন্যত্রস্থানান্তরিত হয়, টেকনিকের ধারা বদলে যায়, নানা কারণেমানুষ তখন নতুন খোঁজে। এতে দুঃখের কোনো কারণ নেই।

সুতরাং আমাদের দেশের কথাসাহিত্যিকদের ভবিষ্যতেরভাবনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। বর্তমানের জন্য তাঁরা লিখেচেন যুগের প্রয়োজনের দিকে চোখ রেখে। এই তাঁদের সবচেয়েবড় আত্মপ্রসাদ। তাঁরাও সেটা খুব ভালোই বোঝেন।

আরো তাঁরা বোঝেন যে কারো অযাচিত পরামর্শ শুনতে গেলে তাঁদের চলবে না। সৃষ্টির প্রবৃত্তি যে মুহূর্তে তারাসমালোচকের ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত নির্দেশের পদানতকরবেন, সেই শূদ্রমনোবৃত্তি তাঁদের অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ইউরোপীয় মধ্যযুগের নাইটদের মতো নির্ভীক, স্বাধীনচেতা যিনি, লাভ বা প্রশংসার কোনো খাতিরেই যিনিপরের রুচির কাছে নিজের রুচি বলি দিতে চান না, লেখনীর ধর্ম তাঁর কাছে অজ্ঞাত নয়।

আর একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক মনে করি। বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের অনেককেই বড় অসহায় অবস্থারসঙ্গে যুঝতে হয়। উপন্যাস রচনা একটি বড় শিল্প, সেইশিল্পসৃষ্টির মূলে যথেষ্ট চিন্তা ও সাধনার প্রয়োজন আছে, ততখানি একনিষ্ঠ চিন্তা তাঁদের রচনাতে দিতে পারেন নাএমন লেখকের সংখ্যাই বেশি। অনেককেই স্কুল-মাস্টারি বাকেরানীগিরি না করলে চলে না।—আমি আমার এক সাহিত্যিকবন্ধুকে জানি যিনি সওদাগরি অফিসে সন্ধ্যা সাতটা কি আটটারসময় কেরানীর কলম ফেলে বাড়ি এসে এক আধটু বিশ্রামকরেই আবার কাগজ কলম নিয়ে গল্প লিখতে বসেন। ইনিপয়সার জন্য লেখেন না। বলেন, আপিসে দিস্তা দিস্তা কাগজলিখে সারাদিন যে ক্লান্তি ও অবসাদ আসে, বাড়ি এসে দু'একপাতা গল্প লিখলে নাকি সেটা কেটে যায়।

এ প্রেস্‌ক্রিপশ্‌ন্ আমি সকলকে পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করিনে, তবে এই ভদ্রলোকের সাহিত্যনিষ্ঠাকে আমিশ্রদ্ধা করি। এদের সাহস ও মনের বলের গুণেই বাংলা সাহিত্য চঞ্চল ও প্রগতিশীল, এক কথায় সজীব।

কিন্তু একথাও ঠিক যে খানিকটা আর্থিক সাচ্ছল্যবাযথেষ্টধ্যানের অবকাশ থাকলে লেখকের সুবিধা হয়। সাহিত্যেরআদর সে দেশের লোকে করতে জানে যে দেশের লোক নতুন বই কিনে পড়ে—নতুবা এক সংস্করণ বই কাটতে পাঁচ বছরলেগে গেলে সে দেশে জীবিকা হিসাবে সাহিত্য-রচনাকে কেউ নিতে পারবে না। জীবিকা হিসাবে না নিলে সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিও সম্ভবপর নয়।

মনে রাখবেন, আমি কোনো ছেঁদো কথা বলচি নে। যদি কেউ এ কথার প্রতিবাদ করেন, যদি বলেন, কেন মশাই, ল্যাম্বতো কেরানীর কাজ করেও দিব্যি সাহিত্য রচনা করেছেন, অমুকতো অমুক করেচেন—তিনি নিতান্তই বইপড়া কথার আবৃত্তিকরচেন বুঝতে হবে—জীবনে তিনি কোনোদিনও জানেন না, যে সময় নভেল বা ছোটগল্পের চমৎকার একটি প্লট বা ঘটনামনে এসেছে, সে সময়ে টুইশনিতে যাওয়া কি কষ্টকর ব্যাপার!

অবশ্য সাহিত্যের প্রতি যে শিল্পীর দরদ আছে, খানিকটাস্বার্থত্যাগ তাকে করতেই হবে। আমার বর্ণিত উপরিউক্তভদ্রলোকের মধ্যে সত্যিকার যে সাহিত্যপ্রীতি আছে, সেইনিঃস্বার্থ দরদই যুগে যুগে দেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেএসেচে—কি এদেশে, কি বিদেশে !

তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান করিলু উদক পান

শিশু কাঁদে ওদনের তরে

কবিকঙ্কণমুকুন্দরামের এ কথা আমরা ভুলি কেমন করে ?

যে সময় সারাদিন খেটেখুটে এসে পথের মোড়ের ক্লাবঘরে তাস খেলা করা চলতো, বা টুইশনিতে গেলে মাসান্তে দশ টাকা বাড়তি আয়ের সংস্থান হতো, সে সময় এই শ্রেণীর দরদী সাহিত্যিকগণ কাগজ কলম নিয়ে হ্যাঁরিকেন লণ্ঠনের তলায় বসে গল্প রচনায় ব্যস্ত থাকেন। যে গল্প হয়তো কোনোঅখ্যাতনামা মাসিকপত্রিকার পাতায় বার হবে, যার জন্যে পত্রিকার সম্পাদক মুখে একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পর্যন্ত করবেন না—দক্ষিণা দেওয়া তো দূরের কথা।

আমাদের এই সব নিয়ে ভাববার সময় এসেচে। দেশেরসাহিত্যিকদের অবস্থা কি করে ভালো করা যায়—এ ভাবনা যিনি ভাবেন, বাংলাসাহিত্যের তিনি একজন দরদী বন্ধু।

তরুণ লেখকদের উৎসাহ-বর্ধন করবার জন্যে ওপ্রতিভাবান তরুণ সাহিত্যিকদের অবস্থা কি করে ভালো করাযায়,–এ ভাবনা যিনি ভাবেন, বাংলাসাহিত্যের তিনি একজনদরদী বন্ধু।

তরুণ লেখকদের উৎসাহ-বর্ধন করবার জন্যে ওপ্রতিভাবান তরুণ সাহিত্যিককে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতকরবার জন্যে আমাদের দেশে সমিতি গঠিত হওয়া দরকার।

দেশের ধনী ও সাহিত্যামোদী ব্যক্তিগণের সাহায্যেই সব দেশেএসব কাজ হয়ে থাকে—আমাদের দেশেও পূর্বে হতো। সব প্রাণীরই অল্পবয়স্ক যারা, তাদের সাহায্য করা দরকার হয়—বিনাসাহায্যে, বিনা সহায়তায় তরুণেরা দাঁড়াতে পারে না—তরুণলেখকদের পক্ষেও একথা খাটে। সাহিত্যক্ষেত্রে যিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, তাঁর কর্তব্য অন্তত একজনও প্রতিভাবান তরুণলেখকের পক্ষাবলম্বন করে তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। যে সবসাহিত্যিক অর্থাভাবে নতুন দেশ দেখতে পারেন না, বিভিন্নপ্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে নব উদ্দীপনা সংগ্রহ করবার অবকাশ পান না—তাঁদের ভ্রমণের বা পড়াশুনার ব্যবস্থা করবার জন্যেইউরোপের অনেক দেশে প্রতিষ্ঠান আছে। আমি এখানে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করব। চেকোশ্লোভাকিয়ায়রবার্ট নোভাক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি আজ দশ বৎসর থেকেতরুণ লেখকদের রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করে সর্বশ্রেষ্ঠবইটি নিজের খরচে প্রকাশ করেন ও গ্রন্থকারকে পুস্তকেরজন্য ২০০ ক্রোনি্ দক্ষিণা দেন, পরবর্তী সংস্করণের স্বত্বলেখকেরই থাকে। আমাদের দেশেও এই রকম প্রতিষ্ঠান হওয়া আবশ্যক। আমরা তখনইমুক্তকণ্ঠে বলতে পারবো-সাহিত্যকেভালোবাসি, যখন আমরা এই ধরনের দুঃস্থতরুণ সাহিত্যিকদেরবিকাশের সুযোগ ও সুবিধা করে দিতে পারব।

সাহিত্যক্ষেত্রে দেশে কোথায় কি হচ্ছে, সে সম্বন্ধেওসচেতন হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কি উপন্যাসের, কি ছোটগল্পের, কি সমালোচনা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেবর্তমানে নানা নূতন প্রচেষ্টার সূত্রপাত সাহিত্যে শুভক্ষণের ও শুভযুগের সূচনা করচে। সাহিত্যের ক্ষেত্রও ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠচে সব দিক থেকে।

সত্যিকার বড় একটা সাহিত্য গড়ে তুলবার মালমশলাসংগ্রহে যে অয়োজন চলেচে চারিদিকে, তাতে করে ভরসাহয় অদূর ভবিষ্যতে ইমারৎ গড়ার কাজও শুরু হয়ে যাবে।বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বাহান্ন বৎসরের জীবনে গোড়ার কাজ অনেকখানিই এগিয়ে দিয়েচেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও বানান সমস্যা ও পরিভাষা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেচেন।এখানে কয়েকটি ব্যক্তিগত উদ্যমের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব তাঁর বৃদ্ধ বয়সে সুবিখ্যাত বিশ্বকোষের যে সংশোধিত ও চিত্রিত দ্বিতীয় সংস্করণবার করচেন তা বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ হবে।পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় মহাকোষ সম্পূর্ণহয়েছে। এ ধরনের শব্দকোষ যে এদেশেবার করা সম্ভব কিছুদিনপূর্বেও আমরা সে কথা ভাবতে পারতাম না। এই উপকরণ সংগ্রহের কাজে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামকরতে হয়। তিনি অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' নামে যে গ্রন্থগুলি সম্পাদন করচেন এবংইতিমধ্যেই 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস', 'বঙ্গীয় নাট্যশালার যে ইতিহাস প্রকাশকরেচেন', বাংলা সাহিত্যেরইতিহাসের সেসবঅমূল্যউপকরণ। এইভাবে নতুন ও পুরাতনের আলোচনায় যদি আমাদেরআত্মবিস্মৃতি দূর হয় তা হলে আশা করতে পারি—অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা সাহিত্য পৃথিবীর দরবারে একটি উল্লেখযোগ্যসাহিত্য বলে গণ্য হবে।

সুখের বিষয় কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনেক দিন থেকেইনূতনের আগমনবার্তা ঘোষিত হচ্ছে। একথা আজ অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই যে বাংলাদেশে কথাসাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যের আসরে সম্মানের আসন লাভ করবার উপযুক্ত হয়েচে। নব নব রসপ্রেরণা ও অনাবিষ্কৃতভূমির অন্বেষণ যদি কথাসাহিত্যের সজীবতার একটা লক্ষণ হয়তবে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে বাংলা কথাসাহিত্য অত্যন্ত প্রাণময়, অত্যন্তসজীব। যাঁরাতরুণ,তাদেরনবপ্রতিভারদানে অনতিদূরভবিষ্যতে আমাদের কথাসাহিত্যকে আরোসমৃদ্ধতর দেখতে পাবো, এ আশা দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিতমনে করবার কারণ ঘটেচে। ১৯৪৫ সালের নামজাদা লেখকগণ এখন এঁদের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সকলের দৃষ্টির অগোচরেবিরাজমান।

আমি পূর্বে একটি প্রবন্ধে লিখেছি যে বর্তমান কালেরশ্রেষ্ঠ ইংরাজি সাময়িক পত্রিকাগুলিতে যে ধরনের ছোটগল্প সাধারণত প্রকাশিত হয়, আমাদের দেশের 'বিচিত্রা', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি কাগজগুলি গল্পসম্পদে সে সবের চেয়ে কমনয়।সব গল্প যে প্রথম শ্রেণীর একথা বলছিনা—কিন্তু আমাদেরদেশের তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্রমিত্র, 'বনফুল' প্রভৃতি কথাশিল্পীর ভালো ছোটগল্পগুলি যে কোনো দেশের যে কোনো শ্রেষ্ঠদরের পত্রিকার গৌরববৃদ্ধিকরতে পারতো—এ কথা প্রতিবাদের ভয় না করেই আমি জোর করে বলতে পারি।

মাঝে মাঝে একটা কথা শোনা যায় যে আমাদের মতো পরাধীন দরিদ্র দেশের সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে কথাসাহিত্যের উপাদান তেমন মেলে না। আমাদের দেশে কি আছেমশাই, যেএ নিয়ে নতুন কিছু লেখা যাবে, 'সেই খাড়া বড়ি থোড়' একথাঅনেক বিজ্ঞ পরামর্শদাতার মুখে শোনা যায়।

এ ধরনের উক্তির সত্যতা বিচার করতে বসলে দেখা যায়এসব কথা মাত্র আংশিকভাবে সত্য। বাংলাদেশের সাহিত্যেরউপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখ দারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা নিরাশা, হাসি কান্না পুলক—বহির্জগতের সঙ্গেতাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যা সকাল, আকাশ বাতাস, ফলমূল-বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনেফুল বিছানো পথের ধারে যেসব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে।

জীবনই কথাসাহিত্যের উপাদান, জীবন যেখানে যতগভীর ও বিচিত্র, কথাসাহিত্যও সেখানে তত গভীর ও বিচিত্র। আমাদের দেশের জীবনধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলেদেখা যাবে, আমাদের নরনারীর জীবনে এমন একটি অপূর্ণআকাঙ্ক্ষা, এমন একটি অসহায় সুরের রেশ রয়েছে, নিজেরপারিপার্শ্বিকের মধ্যেই সরল আনন্দকে খুঁজতে যা ব্যগ্র, অথচ যার আদর্শবাদ অস্পষ্ট নয়, যার ভোগস্পৃহা অবদমিত হলেও অলস নয়—যে জীবনের বিচিত্র অধ্যায়গুলি শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের লেখনীর অপেক্ষা রাখে তাদের পূর্ণ প্রকাশেরজন্যে। চাই কেবল এই সব জীবনের প্রতি লেখকের দরদ ওসহানুভূতি, যে সহানুভূতি নতুন দৃষ্টি দান করে, নতুন সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়, শত বাধাবিরোধ অতিক্রম করে প্রগতিকেআহ্বান করে আনে।